৭

ভারতের বিদেশনীতি
[*Foreign Policy of India*]

৭.১ ভারতের বিদেশনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :
Main Characteristics of India's Foreign Policy

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। স্বাধীনতা লাভের (১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট) পর থেকে আজ পর্যন্ত এই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পেরেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে আস্থাশীল থেকে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে, নির্জোট আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার প্রভৃতি বিরোধিতার ক্ষেত্রে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসহ প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তৃতীয় বিশ্বের দাবি ও সমস্যা তুলে ধরার ক্ষেত্রে, উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার ক্ষেত্রে, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

যে সকল মৌলনীতির ওপর ভিত্তি করে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি রচিত হয়েছে, সেগুলির পরিচয় পাওয়া যায় তদানীন্তন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে **জওহরলাল নেহেরু** কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি বেতার ভাষণ থেকে (১৯৪৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর)। উক্ত ভাষণে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল ৭টি নীতি প্রকাশ পায়, যথা—(১) স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির প্রসারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা ; (২) বিভিন্ন শক্তিজোট থেকে নিজেকে দূরে রাখা ; (৩) ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকার আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা ; (৪) বর্ণবিদ্বেষবাদকে নির্মূল করা ; (৫) ইংল্যান্ড ও কমনওয়েলথ অব নেশনস্-এর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা ; (৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন—উভয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ; (৭) এশীয় দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা।

উপরিউক্ত নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভারতে যে পররাষ্ট্রনীতিটি গড়ে উঠেছে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হল :

(১) পঞ্চশীল : ভারতের বৈদেশিক নীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পঞ্চশীলনীতির অনুসরণ। ইন্দোনেশিয়ার **'পঞ্জৎ শিলা'** (Panjat Shila)-র অনুকরণে ১৯৪৫ সালে তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সর্বপ্রথম 'পঞ্চশীলা'-এর কথা ঘোষণা করেন। নেহেরু বলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত তার নবার্জিত স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ৫টি নীতি অনুসরণ করবে। এই ৫টি নীতিই 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। পঞ্চশীলের ৫টি নীতি হল—(১) প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন ; (২) অনাক্রমণ (Non-aggression) ; (৩) অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ; (৪) সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্য এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful Co-existence)। পঞ্চশীলনীতির প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঘটে ১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির প্রস্তাবনায়। পরবর্তীকালে এই নীতির প্রতিফলন ঘটে ভিয়েতনাম, মায়ানমার, যুগোশ্লাভিয়া, নেপাল, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের চুক্তির ক্ষেত্রে। এ ছাড়া বান্দুং সম্মেলন, আফ্রো-এশীয় সম্মেলন, জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলন, জাতিপুঞ্জের অধিবেশন— প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত তার পঞ্চশীলনীতির প্রতি দৃঢ় আস্থার কথা ব্যক্ত করে।

Scanned with CamScanner

পঞ্চশীলের সাফল্য সম্পর্কে ভারত খুব বেশি আশাবাদী হয়ে পড়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই আশাবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পঞ্চশীলনীতির ভিত্তিতে সম্পাদিত ভারত-চিন চুক্তির কালি শুকিয়ে যেতে না-যেতেই উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যা শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে।

(২) জোট নিরপেক্ষতা : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল জোটনিরপেক্ষতা। জোটনিরপেক্ষতা হল বিশ্বের কোনো শক্তিজোটের সঙ্গে যুক্ত না থেকে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা। তবে জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলেও ভারত যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে নিষ্ক্রিয় থাকেনি, আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা সমস্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেনি। জোটনিরপেক্ষ হয়েও ভারত যুদ্ধ, আগ্রাসন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, অস্ত্রসজ্জা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সরব হয়েছে।

(৩) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। ভারত একদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আগ্রাসী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছে। এল সালভাডোর, নিকারাগুয়া, ফকল্যান্ড দীপপুঞ্জ, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, পানামা প্রভৃতি রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপকে ভারত তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছে।

(৪) নয়া-উপনিবেশবাদ বিরোধিতা : নয়া-উপনিবেশবাদ হল সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ। সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণদান, অস্ত্র বিক্রয়, বিদেশে পুতুল-সরকার গঠন, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, নাশকতামূলক কার্যকলাপে উৎসাহদান, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার মধ্য দিয়ে সরকারের পতন ঘটানো প্রভৃতি নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করে নয়া-উপনিবেশবাদ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ভারত এই নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোচ্চার হয়েছে। আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে, নির্জোট আন্দোলনের শীর্ষ বৈঠকে, জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থায় এবং অন্যত্র ভারত নয়া-উপনিবেশবাদকে আক্রমণ করেছে।

(৫) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন : পরাধীনতার যন্ত্রণাভোগের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে ভারত এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন-আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে। দক্ষিণ রোডেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, উগান্ডা, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারত অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

(৬) বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল এর একনিষ্ঠ বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধিতা। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশের শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতিকে ভারত কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে। জাতিপুঞ্জ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বহিষ্কারে ভারতের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রভৃতি মঞ্চগুলিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছে।

(৭) নিরস্ত্রীকরণ : ভারত মনে করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার। তাই সে নিজে মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন থেকে বিরত থেকেছে, নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে আন্দোলন করেছে এবং আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার রোধে তৎপর হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারত শান্তির উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তির ব্যবহারকে সমর্থন করে।

(৮) বিশ্বশান্তি : ভারত শান্তির পূজারী এবং যুদ্ধের বিরোধী। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্লোগান হল—'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ—প্রভৃতি যুদ্ধের অবসানে ভারত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। দুঃখের বিষয়, বিশ্বশান্তির একনিষ্ঠ পূজারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান, চিন প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

(৯) অন্যান্য : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলি হল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ওপর আস্থা রাখা, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সমালোচনা : ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়। সমালোচকদের মতে, জোটনিরপেক্ষতা ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান স্তম্ভ হলেও, ভারত এই নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৫ সালের ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভারত ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন আক্রমণের নিন্দা করলেও, ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে, অথবা ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের ব্যাপারে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত নীরব থাকে। অনুরূপভাবে ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সমস্যায় ভারত ইজিপ্টের ওপর ইঙ্গ-ফরাসি আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা করলেও, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথাও খরচ করেনি।

সমালোচকদের মতে, ভারত মুখে জোটনিরপেক্ষতার কথা বললেও, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার ভূমিকা বরাবরই **পক্ষপাতমূলক**। যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী ছিল, ততদিন ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেছে ; আবার ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পর বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঢলে পড়ে। উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের ওপর মার্কিন সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে, ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে বের করার নাম করে আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন সেনাবাহিনীর অমানবিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে অথবা যুগোশ্লাভিয়ার ওপর 'ন্যাটো' বাহিনীর অনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া সমালোচকেরা ভারতে বিদেশনীতির মধ্যে নানান **স্ববিরোধিতা** লক্ষ করে থাকেন। ভারত নামিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবকে সমর্থন করে, অথচ কাশ্মীর প্রশ্নে কোনো দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাব উত্থাপনের কথা তুললেই ভারত বেজায় চটে যায়। ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হয়, আবার অন্যদিকে নিজের দেশেই 'বর্ণবৈষম্য ও জাতপাতের নির্লজ্জ রাজনীতি চালিয়ে যায়'। ভারত একদিকে পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন ও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য জাতিপুঞ্জের ভিতরে ও বাইরে প্রয়াস চালায়, অথচ কখনও শান্তির নামে কখনও আত্মরক্ষার নামে পারমাণবিক বোমা বানায় এবং তার বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারত নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে প্রয়াস চালায়, অথচ বৈষম্যের অজুহাত দেখিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র-প্রসার রোধ চুক্তি (NPT) অথবা সার্বিক পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা রোধ চুক্তি (CTBT)-তে স্বাক্ষরদান থেকে বিরত থাকে। ভারত মুখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলে, অথচ পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, চিন, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় না বা পারে না। এরজন্য অনেকে ভারতের 'দাদাগিরি মনোভাব'কে দায়ী করেন।

সমালোচকরা ভারতের বিদেশনীতির বিরুদ্ধে **সম্প্রসারণশীলতার** অভিযোগও তোলেন। তাঁদের মতে, উত্তর সীমান্তবর্তী সিকিম রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে ভারত তার সম্প্রসারণশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার আহ্বান ছাড়াই ভারত বারবার শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। শ্রীলঙ্কার অভিযোগ, সেদেশে গোলমালের পিছনে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি ও ভারতের মদত ছিল।

সমালোচকেরা আরও বলেন, ভারত সুযোগ পেলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে, কিন্তু সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই ভারতকে বারবার আত্মসমর্পণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৬ সালের ২৯ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে **সুনীত ঘোষের** একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়ে যেতে পারে : "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলা আমাদের সরকারের এক প্রকার বিলাস। অথচ বিপদে পড়লে আমাদের নেতারা যে 'প্রতিক্রিয়ার দুর্গ' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হন, সে তো ঐতিহাসিক সত্য।"

উপসংহার : ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ (পক্ষপাতিত্ব, স্ববিরোধিতা, সম্প্রসারণশীলতা, ভণ্ডামি ইত্যাদি) আনা হয়, সেগুলি যে ভিত্তিহীন তা বলা যাবে না। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ ধরনের আচরণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভারত কেন, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের বৈদেশিক নীতিতে কিছু পরিমাণ স্ববিরোধিতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। আসলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায়, যে-কোনো দেশের বিদেশনীতি পরিচালিত হয় জাতীয় স্বার্থের দ্বারা। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতির আশ্রয় নিয়েছে, আবার সময় বিশেষে সোভিয়েত জোট অথবা মার্কিন জোটের পক্ষ অবলম্বন করেছে ; জাতীয়

Scanned with CamScanner

স্বার্থের খাতিরেই ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যায় কোনো কোনো দেশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে, আবার কখনো কখনোও নীরব থেকেছে ; জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি চেয়েছে, আবার পাকিস্তান, চিন প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ভারত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছুটা তোষণ করার নীতি নিয়ে চলছে, তা এই জাতীয় স্বার্থ তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই।

৭.২ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান স্তম্ভস্বরূপ জোট-নিরপেক্ষতা

Non-Alignment as the Keynote of India's Foreign Policy

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল জোটনিরপেক্ষতা ('Non-alignment is the keynote of India's foreign policy.')। জোটনিরপেক্ষতার অর্থ হল বিশ্বের কোনো শান্তিজোটের সঙ্গে যুক্ত না থেকে স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, জোটনিরপেক্ষ মানে এই নয় যে, ভারতবর্ষ কোনো দেশের সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে তাকে সবসময় নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। **জোটনিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ** (Passive neutrality) এক জিনিস নয়। এই প্রসঙ্গে নেহেরু বলেন, 'যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন এবং ন্যায়নীতি আক্রান্ত, সেখানে আমরা কখনোই নিরপেক্ষ থাকতে পারি না' ("Where freedom is endangered and justice threatened, we cannot and shall not be neutral.")। ইতিবাচকভাবে বললে, জোটনিরপেক্ষতা হল স্বাধীনভাবে কাজ করার নীতি অনুসরণ ("Non-alignment is freedom for action which is part of independence"—Nehru)।

বস্তুত জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলেও ভারত আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা সমস্যা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখেনি। কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কঙ্গো সংকট, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন মতামত জ্ঞাপন করেছে। যুদ্ধ, আগ্রাসন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, আণবিক অস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতির বিরুদ্ধে ভারত সরব হয়েছে। একদিকে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী নীতি ও ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে ভারত জাতিপুঞ্জসহ যে-কোনো আন্তর্জাতিক মঞ্চে বা সম্মেলনে বা শীর্ষবৈঠকে অনুন্নত দেশগুলির স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছে। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা, তথ্য ব্যবস্থা, ৭৭-এর গোষ্ঠী, আফ্রিকা তহবিল গঠন, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির জাতীয় সত্তা প্রতিষ্ঠায় ভারত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। বস্তুত বিশ্বের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয় ও সমস্যা ছিল না যেখানে ভারত বলিষ্ঠভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি।

জোটনিরপেক্ষতা নীতি সমদূরত্বের নীতি নয়। সহজভাবে বললে, ভারত জোটনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে বলে তাকে পুঁজিবাদী জোট ও সমাজতান্ত্রিক জোট থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বস্তুতপক্ষে ভারত জোটভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির রূপকারগণ সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, বর্তমান বিশ্বে ভারতের পক্ষে বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের কারণ :

ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কারণে। **মাইকেল ব্রেচার** (Michael Brecher) তাঁর *Foreign Policy of India* শীর্ষক প্রবন্ধে ওইসব কারণকে মূলত দু-ভাগে ভাগ করেছেন—(১) **বস্তুগত** এবং (২) **অবস্তুগত**। বস্তুগত কারণের মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক উন্নতি। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারতের একদিকে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ পাকিস্তান এবং অন্যদিকে কমিউনিস্ট চিন। নেহেরু বলেছিলেন, এই অবস্থায় কোনো একটি জোটে যোগদান করার অর্থই হবে অন্য জোটের বিরাগভাজন হওয়া এবং যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলা। তাই কোনো জোটে যোগ না দিয়ে জোটনিরপেক্ষতার নীতি

Scanned with CamScanner

অনুসরণ করাই ছিল ভারতের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। বস্তুত ভারত যদি জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ না করত, তাহলে এটি বৃহৎ শক্তিবর্গের রণক্ষেত্রে পরিণত হত। **অর্থনৈতিক দিক থেকে** জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার যুক্তি ছিল এই যে, সদ্য স্বাধীন ভারতের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জরিত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের, যা ভারতকে প্রধানত বিদেশ থেকে ঋণ বা সাহায্য নিয়ে জোগাড় করতে হবে। এই অবস্থায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অনুভব করেছিলেন যে, ভারত যদি কোনো একটি জোটে যোগ দেয়, তাহলে অন্য জোটের কাছ থেকে কোনো অর্থনৈতিক সাহায্য পাবে না। তাই জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করাই শ্রেয়, যাতে বিশ্বের সকল দেশের কাছ থেকেই ঋণ বা সাহায্য পাওয়া যায় এবং দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারিত করা যায়।

অবস্তুগত কারণের মধ্যে পড়ে ইতিহাস, দর্শন, ঐহিত্য ইত্যাদি। ভারতের সনাতন ঐতিহ্য হল শান্তি, অহিংসা এবং পরমত সহিষ্ণুতা। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির রূপকারগণ ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, কোনো শক্তিজোটের মধ্যে ঢোকা মানেই অশান্তি ডেকে আনা। তাই জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করলে শান্তি থাকবে এবং পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ উভয় মতাদর্শের ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করা যাবে।

সমালোচনা : জোটনিরপেক্ষতা ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান স্তম্ভ হলেও, সমালোচকদের মতে ভারত এই নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম বিচ্যুতি ঘটে ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময়। ওই সময় ভারত কোরিয়াতে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ সমর্থন করলেও জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩৩ অক্ষাংশ লঙ্ঘন সমর্থন করেনি। এজন্য ভারতকে সমলোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

জোটনিরপেক্ষ নীতি থেকে ভারতের দ্বিতীয়বার বিচ্যুতি ঘটে ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সমস্যার সময়। ওই সময় ভারত ইজিপ্টের ওপর ব্রিটিশ ও ফরাসি আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করলেও, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথাও খরচ করেনি।

১৯৬৮ সালে পুনরায় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষপাতমূলক আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হলে ভারত ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে, কিন্তু ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত নীরব থাকে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি পুনরায় সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ওই যুদ্ধে মার্কিন আক্রমণের আশঙ্কায় এবং নিজের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সমালোচকদের মতে, ওই চুক্তি ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও ভারত নীরব থাকে। অথচ আফগানিস্তান একটি জোটনিরপেক্ষ দেশ।

বাস্তবিকপক্ষে ৮০-র দশক পর্যন্ত ভারতের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একদিকে ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে, আবার অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য কারণে ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলেছে।

তবে ৮০-র দশকের শেষ থেকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বড়ো রকমের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ওই সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির রমরমা অবস্থা, সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, বিশ্ব রাজনীতিতে একদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য হ্রাস অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য—এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। এই সময় থেকে ভারত-মার্কিন সমঝোতা নতুন গতি পায়। ১৯৯১ সালে সংঘটিত উপসাগরীয় যুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পথিকৃৎ ভারতবর্ষ জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে নিয়ে জাতিপুঞ্জ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু তা না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর মার্কিন সামরিক বিমানকে ভারত থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের মানবতা বিরোধী আচরণ ও

Scanned with CamScanner

জাতিপুঞ্জের মার্কিন তোষণনীতির বিরুদ্ধে ভারত একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। গ্যাট চুক্তি, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতি ইস্যুতে ভারত নির্জোট আন্দোলনের চেয়ে নিজের স্বার্থকে বড়ো করে দেখেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে এই পরিবর্তনের কারণ নিহিত আছে পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির মধ্যে। যে নির্জোট আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত সাম্প্রতিক অতীতে শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সেই নির্জোট আন্দোলনের প্রাণভোমরা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে নির্জোট আন্দোলন ও তার মুখপাত্র ভারত দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতকেও ক্রমশ বিশ্বব্যাপী মার্কিন প্রাধান্যের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে।

৭.৩ ভারতের বিদেশনীতির বিবর্তন

Evolution of India's Foreign Policy

ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। তখন থেকে আজ পর্যন্ত—এই সাত দশক ধরে ভারতের বৈদেশিক নীতি নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল নীতিগুলি এখনও পর্যন্ত একই আছে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলে যায় ; আর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গিয়ে ভারতকে তার বিদেশনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়েছে। ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ ; এখানে বিদেশনীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্ব থাকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর আমলে বিদেশনীতিতে কী পরিবর্তন এসেছে, নিম্নে সেই বিষয়টি আলোচনা করা হল।

জওহরলাল নেহেরু (১৯৪৭-৬৪) : ভারতের বিদেশনীতির প্রধান রূপকার ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। তিনি ছিলেন একজন শান্তিকামী আদর্শবাদী মানুষ। তাই সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল বিদেশনীতি তাঁর পছন্দসই ছিল না। যুদ্ধমুক্ত শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর ধারণায় আস্থাশীল নেহেরু ভারতকে সামরিক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি চাইতেন আন্তর্জাতিক বিরোধ বা সমস্যার 'রাজনৈতিক' সমাধান, 'সামরিক' সমাধান নয়। তবে নেহেরু চাইলেও বাস্তব পৃথিবী নেহেরু নির্দেশিত পথে হাঁটেনি। ১৯৬২ সালে চিনের আক্রমণ এবং ভারতের শোচনীয় পরাজয় ভারতকে বুঝিয়ে দেয় যে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে সামরিক শক্তিকে উপেক্ষা করে জাতীয় স্বার্থ পূরণ একটি অলীক কল্পনাবিলাস মাত্র।

নেহেরুর আমলে জোটনিরপেক্ষতাকে ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। **এই জোটনিরপেক্ষতার অর্থ 'নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা' নয়,** এর অর্থ হল বিশ্বের কোনো শক্তিজোটের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। বস্তুত জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেও ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী নীতি ও ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, যুদ্ধ, আগ্রাসন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, আণবিক অস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

তবে সমালোচকদের মতে, নেহেরুর আমলে ভারত জোটনিরপেক্ষনীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। প্রথম বিচ্যুতি ঘটে ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময়। ওই সময় ভারত উত্তর কোরিয়ার আগ্রাসন সংক্রান্ত অভিযোগ সমর্থন করলেও মার্কিন নেতৃত্বে কোরিয়ায় যৌথ আক্রমণে অংশ নিতে কিংবা চিনকে আগ্রাসী বলে চিহ্নিত করতে অস্বীকার করে। জোটনিরপেক্ষ নীতি থেকে ভারতের দ্বিতীয়বার বিচ্যুতি ঘটে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি দুটি সমান্তরাল সংকট—সুয়েজ ও হাঙ্গেরি-কে কেন্দ্র করে। ওই সময় ভারত ইজিপ্টের ওপর ব্রিটিশ ও ফরাসি আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করলেও, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথাও খরচ করেনি।

তবে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, জোটনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক হয়েও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো হয়েছিল জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই। পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি ভারতকে তার নির্জোট অবস্থান থেকে সরে আসার কথা বলে ; কাশ্মীর সমস্যাটির আন্তর্জাতিক স্তরে সমাধানের কথা বলে। অপরপক্ষে, কাশ্মীর প্রশ্নে

Scanned with CamScanner

সোভিয়েত রাশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছে এবং ভারতের স্বার্থ-বিরোধী যে-কোনো প্রস্তাবেই (যেমন গোয়ার মুক্তির প্রশ্নে) ভেটো প্রয়োগ করেছে। ভারতের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন'-এর আদর্শকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েছে ; বড়ো বড়ো কলকারখানা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ইস্পাত শিল্প ইত্যাদির নির্মাণে ভারতকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, প্রযুক্তি, দক্ষ কারিগর, স্বল্প সুদে ঋণ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছে।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (১৯৬৪-৬৬) : ১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি খুব অল্পদিন (মাত্র উনিশ মাস) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর আমলে ভারতের বিদেশনীতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে অবনতি ঘটে, শাস্ত্রীর আমলেও সেই ধারা অব্যাহত থাকে। কাশ্মীর প্রশ্নে চিন পাকিস্তানকে নৈতিক সমর্থন জানায়। এ ছাড়া ওইসময় চিন পাকিস্তানকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র সাহায্য করে। চিনের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য লাভ করে এবং চিন-ভারতের সামরিক দুর্বলতায় উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে খুব তুচ্ছ কারণে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধে দুই মহাশক্তি প্রায় নির্লিপ্ত থাকে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রধানত এদের উদ্যোগে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক আয়ুব খান একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ইন্দিরা গান্ধি (১৯৬৬-৭৭ এবং ১৯৭৯-৮৪) : তাসখন্দে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং প্রায় আকস্মিকভাবেই তাঁর শূন্য আসনটি দখল করেন নেহেরু-কন্যা ইন্দিরা গান্ধি (১৯৬৬, জানুয়ারি)। জোটনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, বর্ণবিদ্বেষবাদ বিরোধিতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি জওহরলাল নেহেরু অনুসৃত ভারতের বিদেশনীতির মূল বিষয়গুলিকে পরিবর্তন না করলেও শ্রীমতী গান্ধি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে পিতার পথ থেকে আনেকখানি সরে এসেছিলেন। নেহেরু শান্তির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে দেশের সামরিক প্রস্তুতির দিকটিই অবহেলা করেছিলেন এবং তার ফলও ভোগ করতে হয়েছিল ভারতকে। ইন্দিরার বিবেচনায় ক্ষমতা অর্জনই শান্তি রক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ। তাই তিনি ভারতকে এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধির সময় ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় তথা সমগ্র এশিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে এক দীর্ঘ মেয়াদি শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি ভারতকে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করেছিল। ১৯৭৪ সালে পোখরানে ভারত আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় চিন ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তি সম্প্রসারণের প্রতিষেধক হিসেবে।

সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রই যে তার জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তা হাতে-নাতে প্রমাণিত হয় ১৯৭১ সালে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে। বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু করে। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ভারত পাকিস্তানকে শুধু যুদ্ধে পরাজিত করে তাই নয়, সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় সফল হয়। একদিকে পাকিস্তানের বিভাজন এবং অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তামূলক চুক্তি সম্পাদন—এই দুই-এর প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য ভারতের দিকে ঝুঁকে আসে। ভারতের পাকিস্তান বিজয় একদিকে ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দেয়, অন্যদিকে স্বৈরাচারী পাক শাসকবর্গকে ভারতের সঙ্গে একটি স্থায়ী সমঝোতায় আসতে বাধ্য করে। ১৯৭২ সালের জুন মাসে পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টো শ্রীমতী গান্ধির সঙ্গে এক বৈঠকে বসলেন এবং ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তি-তে স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তিতে বলা হল : (ক) উভয় দেশ পরস্পরের সার্বভৌম অখণ্ডতা বজায় রাখবে ; (খ) যুদ্ধোত্তর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা মেনে চলা হবে ; (গ) ভবিষ্যতে দুটি দেশের মধ্যে যে-কোনো বিরোধের মীমাংসা হবে শান্তিপূর্ণভাবে দ্বি-পাক্ষিক স্তরে।

শুধু সামরিক শক্তি বৃদ্ধিই নয়, ইন্দিরা গান্ধির আমলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যার ফলে ভারতের আর্থিক দুর্গতিও অনেকটা কেটে যায়।

Scanned with CamScanner

মোরারজি দেশাই ও চরণ সিং (১৯৭৭-৭৯) : ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটলে ভারতে প্রথম অ-কংগ্রেসি কোয়ালিশন সরকার (জনতা) গঠিত হয়। মোরারজি দেশাই এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সরকার ভারতের বিদেশনীতির সোভিয়েত ঝোঁক কাটিয়ে উঠতে এবং প্রকৃত জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণে সচেষ্ট হয়। প্রসঙ্গত, ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমি দুনিয়ার কাছে সোভিয়েত-পন্থীরূপে পরিচিত ছিল। মোরারজি এই তকমা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেন। ১৯৭৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে আসেন। ওই বছরই জুন মাসে মোরারজি রাষ্ট্রীয় সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান। দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানের এই পারস্পরিক সফর এযাবৎকালের শীতল সম্পর্কে উষ্ণতার স্পর্শ লাগায়।

জনতা আমলে আর যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় সেগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইসরায়েল-এর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইজরায়েলের সঙ্গে এযাবৎ ভারতের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। এ ছাড়া এই পর্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ভারত সম্পর্কে তাদের আতঙ্ক দূর করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

অন্তর্কলহের জেরে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে মোরারজি দেশাই পদত্যাগ করলে **চরণ সিং** জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি মাত্র ছয় মাস প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আমলে বিদেশনীতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

রাজীব গান্ধি (১৯৮৪-৮৯) : ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির প্রাণনাশের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজীব গান্ধি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তরুণ প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ছিল তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তিনি মায়ের মতো সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে তিনি উদ্যোগ নেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি প্রথমে সোভিয়েত রাশিয়া এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান এবং উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন এবং রেগান প্রশাসনের কাছ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কমপিউটার Cray XMP-24 কেনার সম্মতি আদায় করেন।

রাজীব গান্ধির আমলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৮৮ সালে তাঁর চিন সফর। নেহেরুর পর দীর্ঘদিন বাদে কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী চিন সফরে গেলেন। রাজীবের এই সফর পুরানো সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে দুটি দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। তাঁর সফরকালে সীমান্ত সমস্যা আলোচনার জন্য দু-দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে Joint Working Group (JWG) গঠিত হয়, পরবর্তীকালে তা চিন-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

রাজীব গান্ধি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর ব্যাপারেও উদ্যোগ নেন। তিনি পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠক দু-দেশের মধ্যে সামরিক ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তবে তরুণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির বিদেশনীতির একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত ছিল শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ, যে ভুলের খেসারত দিতে হয়েছিল নিজের প্রাণের বিনিময়ে। শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিল জনগোষ্ঠীর লড়াই দীর্ঘদিনের। তামিল জনগোষ্ঠীর সমর্থনে সংগ্রামরত LTTE-কে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে শ্রীলঙ্কার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের অনুরোধে একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয় ভারতবর্ষ থেকে। অপরিচিত বনাকীর্ণ অঞ্চলে LTTE-র সঙ্গে অসম লড়াইয়ে ভারতীয় সৈন্যদল পর্যুদস্ত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এতে একদিকে ভারতীয় সেনাদলের গৌরবহানি ঘটে এবং অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার মতো একটি ছোটো দেশে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ শ্রীলঙ্কাবাসী সহ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ভালো চোখে দেখেনি।

ভি পি সিং (১৯৮৯-৯০) এবং চন্দ্রশেখর (১৯৯০-৯১) : ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত লোকসভার নির্বাচনের পর যে জাতীয় মোর্চা সরকার (National Front) ক্ষমতায় আসে, তার প্রধানমন্ত্রী হন ভি পি সিং। এই সরকার খুব অল্পদিন ক্ষমতায় ছিল। স্বাভাবিকভাবে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ছাপ

Scanned with CamScanner

রাখতে পারেনি এই সরকার। তা ছাড়া 'মণ্ডলায়ন' নীতি নিয়ে এই সরকার এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানো হয়নি। ওই বিষয়গুলি পরিচালনা করতেন প্রধানত বিদেশ মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত আই কে গুজরাল এবং তাঁর অধীন পদস্থ আমলারা। গুজরাল দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন—(১) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো এবং (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নরম মনোভাব প্রদর্শন। মার্কিন যুদ্ধবিমানকে ভারতে জ্বালানি ভরার অনুমতি দেওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক-নীতির ব্যাপারে নীরব থাকা ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নরম মনোভাবের পরিচায়ক। ১৯৯০ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সরকারের পতন ঘটলে চন্দ্রশেখর কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থনে সরকার গঠন করেন। এই সরকার সাকুল্যে ৬ মাস ক্ষমতায় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারের পক্ষে নতুন কিছু করার অবকাশ ছিল না।

পি ভি নরসিংহ রাও (১৯৯১-৯৬) : ১৯৯১ সাল ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ওই বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে জোট রাজনীতি তথা ঠান্ডা লড়াই বিদায় নেয়, দ্বি-মেরুতার অবসান ঘটে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-রাজনীতির প্রধান নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়। তা ছাড়া এই সময় থেকেই বিশ্বায়ন একটা বাড়তি গতি পায়। নরসিংহ রাও সরকার চেষ্টা করেছিল এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে দেশের বিদেশনীতিকে খাপ খাইয়ে নিতে। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও বুঝেছিলেন, এক-মেরু বিশ্বে ভারতের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো এবং তার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতির উদারীকরণ। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ২ মাসের মধ্যেই রাও সরকার ভারতের অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের জন্য একগুচ্ছ সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। রাও সরকারের এই নয়া-উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে US-India Commercial Alliance (USICA) গঠন করে এবং ওই বছর জুলাই মাসে ভারতকে বৃহৎ সম্ভাবনাময় বাজার (Big Emerging Market) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ফলত দু-দেশের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক অনেক বেশি দৃঢ় হয়। এ ছাড়া রাও সরকারের আমলে নেপালের সঙ্গে মহাকালী চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হয়। একই সঙ্গে ভারত ওই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বিশেষ করে আসিয়ান (ASEAN)-এর কাছাকাছি আসার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল নরসিমা সরকার কর্তৃক পূর্বে তাকাও (Look East) নীতি গ্রহণ। এই নীতির মাধ্যমে একদিকে ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা চালায় এবং অন্যদিকে এতদঞ্চলে চিনের প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা করে। এই ভাবে রাও সরকার বিদেশনীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে প্রাধান্য দেওয়ার এক নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটায়।

দেবগৌড়া (১৯৯৬-৯৭) এবং গুজরাল (১৯৯৭-৯৮) : নরসিংহ রাও-এর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী। তবে তিনি মাত্র ১৩দিন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী হন এইচ ডি দেবগৌড়া। দেবগৌড়া সরকার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর আমলে চিন ও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

১৯৯৭ সালে এপ্রিল মাসে দেবগৌড়া প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ালে ইন্দ্র কুমার গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। গুজরাল সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া গুজরাল সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়।

অটল বিহারী বাজপেয়ী (১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০৪) : দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন (১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ)-এর পর কেন্দ্রে যে NDA (National Democratic Alliance) জোট ক্ষমতায় আসে, BJP নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী তার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতায় আসার পর NDA সরকার তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মতো ১৯৯৮ সালের ১১ ও ১৩ মে রাজস্থানের পোখরানে শক্তিশালী পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়। এর জবাবে পাকিস্তান মে মাসের শেষে সমসংখ্যক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বলেন যে, ভারতের বিস্ফোরণ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে

Scanned with CamScanner

করা হয়েছে, কোনো দেশকে আঘাত করার জন্য নয়। বাজপেয়ী আরও বলেন, ভারত কখনোই ওই মারণাস্ত্রের প্রথম ব্যবহার করবে না ('No first use')।

ভারত-পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে এবং পূর্ববর্তী গুজরাল সরকারের শান্তি-প্রক্রিয়ার অপমৃত্যু ঘটায়। শুধু পাকিস্তানের সঙ্গেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক তলানিতে এসে দাঁড়ায়।

তবে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণের এক মাসের মধ্যেই, ১১জুন, ১৯৯৮ থেকে উভয় দেশ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষিণ এশিয়ার উত্তেজনা প্রশমন নিয়ে আলোচনা বসে। ২০০১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে এই আলোচনা চলে দিল্লি, ওয়াশিংটন, রোম, ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে। ভারত পাকিস্তান উভয়েই উত্তেজনা হ্রাসের প্রয়োজনে আলোচনার পথটিকে বেছে নেয়। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাজপেয়ী দিল্লি থেকে বাসযোগে পাঞ্জাবের ওয়াগা সীমান্ত পেরিয়ে লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ২১ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯-এ বাজপেয়ী ও পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ **'লাহোর ঘোষণা'য়** স্বাক্ষর করেন।

১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনের পর বাজপেয়ী দ্বিতীয়বার (১৯৯৬ সালে ১৩ দিনের প্রধানমন্ত্রীত্ব বাদ দিয়ে) প্রধানমন্ত্রী হন। এই পর্বে ভারতের বিদেশনীতি অনেক বেশি পরিণত হয়ে ওঠে। বাজপেয়ীর দ্বিতীয় পর্বের বিদেশনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল রাশিয়া, চিন, আমেরিকা ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি, আসিয়ান (ASEAN) গোষ্ঠীর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি, নেপাল, ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ইত্যাদি।

২০০০ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি **ভ্লাদিমির পুতিন** ভারতে আসেন এবং ভারতকে প্রচুর অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। পুতিন ও বাজপেয়ী বহুমেরুবিশিষ্ট বিশ্ব গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ২০০১ সালের নভেম্বরে বাজপেয়ী রাশিয়া সফরে যান এবং 'মস্কো ঘোষণা'য় সাক্ষর করেন। মস্কো ঘোষণায় দু-দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো ছাড়াও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক সম্পর্কও যে মজবুত করা দরকার—এই উপলব্ধি থেকে বাজপেয়ী সরকার পূর্ববর্তী নরসিমা সরকারের 'Look East' নীতিকে আরও সক্রিয় করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এই Look East নীতির অঙ্গ হিসেবে বাজপেয়ী সরকার ASEAN গোষ্ঠীর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে কার্যকর উদ্যোগ নেয়। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও ভারতের ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর বিদেশনীতির সাফল্যের অপর একটি নজির হল চিনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন। রাজীব গান্ধির আমলে চিনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল, বাজপেয়ীর আমলে তা আরও দৃঢ় হয়।

মনমোহন সিং (মে, ২০০৪ থেকে ২০১৪) : ভারতের চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি। তবে বামদলগুলির সমর্থনে কংগ্রেস জোট United Progressive Alliance (UPA) কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন মনমোহন সিং এবং বিদেশমন্ত্রী হন নেহেরুপন্থী হিসেবে পরিচিত নটবর সিং। বিদেশমন্ত্রী হিসেবে নটবর সিং যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি।

বিদেশমন্ত্রী হিসেবে নটবর সিং প্রথম বিদেশ সফরে নেপাল যান। সেখানে তিনি ভারত-নেপাল মৈত্রীর ওপর গুরুত্ব দেন এবং নেপালের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সন্ত্রাসবাদ দমনে সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। পূর্ববর্তী নরসিমা সরকারের আমলে যে Look East নীতির সূত্রপাত হয়, UPA সরকারের আমলে তার সার্থক রূপায়ণের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। চিন, জাপান, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে ড. মনমোহন সিং ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক UPA সরকারের আমলে আগের থেকে মজবুত হয়েছে। মহাকাশ গবেষণা, তৈল অনুসন্ধান, বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উভয় দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক ও ইরান নীতির মূল্যায়নে চিন-ভারত সহমত প্রকাশ করেছে।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও এই সরকারের আমলে ক্রমশই সদর্থক রূপ নিয়েছে। দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে কাশ্মীর ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ আগের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে।

তবে ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে মুম্বাই-এর তাজ হোটেল, ওবেরয় হোটেলসহ অন্যান্য স্থানে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গীহানার প্রক্ষিতে ভারত-পাক সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। পাকিস্তান যথারীতি এ ব্যাপারে তার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। অবশ্য সন্ত্রাস দমনে ভারতকে আশ্বাস দিতে ভোলেনি পাক সরকার।

২০০৯ সালে মনমোহন সিং দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু চিনের সঙ্গে সম্পর্ক আগের জায়গাতেই থেকে যায়। মনমোহন সিং-এর দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল জাপান ও ইজরায়েল-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো। অবশ্য ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক শুরু হয় ২০০৩ সাল থেকেই। ওই সময় থেকে উভয় দেশই পরস্পরের সঙ্গে অর্থনৈতিক লেনদেন বাড়িয়ে তোলে। মনমোহনের বিদেশনীতিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে অর্থনীতি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ যত বাড়বে, ততই ভারতের মঙ্গল। মহমোহনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, বিশ্বের সমস্ত জাতির উন্নতির জন্য ভারত আন্তর্জাতিক সমাজের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সৃষ্টি করবে একটি বিশ্বায়িত অর্থনীতি এবং নিরাপদ দূষণমুক্ত পরিবেশ। তৃতীয়ত, তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিতেন।

নরেন্দ্র মোদী (২০১৪-.....) : মনমোহন সিং-এর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী ক্ষমতায় আসেন ২০১৪ সালের ২৬ মে। তাঁর আমলে বিদেশ দপ্তরের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় সুষমা স্বরাজ-এর হাতে। এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মোদী সরকার যা করেছে, তা পূর্ববর্তী সরকারগুলির পথ ধরেই। আগের সরকারগুলির মতোই মোদী সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে চেয়েছে। আগের সরকারের পথ ধরে মোদীও ভারতকে একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ক্ষমতায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদী ভুটান, নেপাল, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মায়ানমার, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি প্রভৃতি দেশে সরকারি সফরে গিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী স্বরাজকে পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, বাহরিন, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, মালদ্বীপ, ইউ এ ই, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, ওমান, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশে। সুষমা স্বরাজ ভিয়েতনামে গিয়ে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সেটি হল Act East Policy। এই Act East Policy আগের দু-দশক ধরে চলে আসা Look East Policy-র নতুন নাম। এই নতুন নামকরণের মাধ্যমে মোদী সরকার পূর্বের দেশগুলির ব্যাপারে যে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহী তা বোঝানো হয়েছে।

শুধু পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে নয় পশ্চিম এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও মোদী সরকার সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে বদ্ধপরিকর। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ ভারত বিদেশ থেকে যে পরিমাণ খনিজ তেল আমদানি করে তার দুই-তৃতীয়াংশই এখান থেকে, বিশেষ করে UAE এবং উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে যায়। তা ছাড়া এইসব দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যাবসাবাণিজ্যও সাম্প্রতিককালে অনেকগুণ বেড়েছে। প্যালেস্তাইনের ব্যাপারে মোদীর ভারত অনেক সহানুভূতিশীল। সে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রেখেও প্যালেস্তাইনের দাবিকে সমর্থন জানায়।

মোদীর আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এক নতুন মাত্রায় পৌঁছায়। প্রথম দিকে অনেকের সংশয় ছিল, মোদীর ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে না, কারণ ২০০৫ সালে মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি তাঁর যথেষ্ট মানবাধিকার বোধের অভাবের অভিযোগে। কিন্তু সমস্ত সংশয়কে মিথ্যা প্রমাণ করে ২০১৪ সালে মোদীর বিপুল জনসমর্থনের

Scanned with CamScanner

নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোদীর ভারতের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রথমে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ন্যান্সি পাওয়েল মোদীকে দেশের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা স্বয়ং মোদীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমন্ত্রণ জানান। ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪—মোদীর এই চারদিনের মার্কিন সফরের শুরুটা হয় প্রথমে জাতিপুঞ্জের সাধারণসভায় ভাষণদানের মধ্য দিয়ে। ওবামার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের 'Make in India' কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন রাখেন। প্রত্যুত্তরে ওবামা মোদীকে 'কাজের মানুষ' (Man of Action) অভিধায় ভূষিত করেন। ২০১৪ সালের ৯ ডিসেম্বর রিচার্ড রাহুল ভার্মাকে ভারতের জন্য মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসবের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে আগ্রহী। মোদীর উষ্ণ অভ্যর্থনায় সাড়া দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা অল্পদিনের ব্যবধানে দু-বার ভারত সফরে আসেন এবং ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ইঙ্গিত দিয়ে যান।

ওবামার কার্যকাল শেষ হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ২০১৭ সালের ২৬ জুন, মোদী ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাণিজ্য, বিমান, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, পৃথিবীর অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও মোদীর ভারত সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কানাডা থেকে শুরু করে পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ সফরে গিয়ে মোদী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার আবেদন রেখেছেন।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শান্তি, প্রগতি, নিরাপত্তা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, ঔপনিবেশিকতা বিরোধিতা, বর্ণবিদ্বেষবাদ বিরোধিতা প্রভৃতি ভারতের বিদেশনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলিতে আস্থাশীল থেকেও স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই ৭০ বছরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে একটা পরিবর্তনের চোরা স্রোত বয়ে গেছে। প্রথমদিকে ভারতের বিদেশনীতির রূপকারগণ একটা আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছিলেন। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে চিন-ভারত যুদ্ধ (১৯৬২) এবং ভারত-পাক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভারতের বিদেশনীতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে ভারত সাময়িকভাবে দিশাহীন হয়ে পড়ে। তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ খুব সঠিকভাবেই অনুধাবন করেন, শুধু সামরিক শক্তিতে নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে। অন্যথায় ভারতকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্রাত্যের অসম্মান নিয়েই চলতে হবে। তখন থেকেই শুরু হয় ভারতের বিদেশনীতির নতুন অভিমুখ—বিশ্বের অন্যতম বৃহৎশক্তি হিসেবে গণ্য হওয়ার অভিমুখ।

বস্তুত শুধু কথার কথা নয়, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের হাত ধরে ভারত আজ চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। মেধার দিক থেকে ভারতের স্থান আজ তৃতীয় এবং উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের নিরিখে নবম। তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ থেকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে উন্নীত হয়ে একটি শক্তিশালী দেশ ভারত আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সমীহ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের বিপুল বাজার শুধু প্রতিবেশী দেশগুলির নয়, বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলির কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ১৯১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার গঠনের পর থেকে ভারতের একটি বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার প্রবণতা ক্রমশ আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

৭.৪ ভারতের বিদেশনীতির নির্ধারক উপাদানসমূহ

The Determinants of India's Foreign Policy

যে-কোনো দেশের বিদেশনীতি গড়ে ওঠার ব্যাপারে একাধিক উপাদান ক্রিয়াশীল থাকে। এইসব উপাদানের মধ্যে কিছু দেশের অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে, আবার কিছু দেশের বাইরে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে। প্রথমোক্ত উপাদনাগুলিকে অভ্যন্তরীণ উপাদান বলা হয়, যার অন্তর্গত হল ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামরিক শক্তি ইত্যাদি। আর বাহ্যিক

Scanned with CamScanner

উপাদানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিদেশি রাষ্ট্রগুলির বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির আচরণ ও প্রতিক্রিয়া, বিশ্বজনমত ইত্যাদি। এই সমস্ত নির্ধারককে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল :

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান : ভারতেরও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে বিদেশি আক্রমণ তথা আগ্রাসন থেকে সুরক্ষিত রেখেছে। একমাত্র ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় চিন হিমালয়ের উচ্চতাকে উপেক্ষা করে ভারতকে আক্রমণ ও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ পর্যন্ত ভারতের ওপর যেসমস্ত বহিরাক্রমণ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি হয়েছে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত থেকে, কারণ ওই অঞ্চলে হিমালয়ের মতো কোনো সুউচ্চ প্রাকৃতিক প্রাচীর নেই। তবে প্রাকৃতিক প্রাচীরের মধ্যেই রয়েছে কিছু গিরিপথ, যে গিরিপথ দিয়ে ভারতকে আক্রমণ করা যেতে পারে এবং তার নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে। ভারতের বিদেশনীতি প্রণয়নের সময় এই বিষয়টিকে মাথায় রাখতে হবে।

ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণে দক্ষিণে অবস্থিত ভারত মহাসাগরের ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। শুধু নিরাপত্তার কারণেই নয়, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূলেও রয়েছে এই ভারত মহাসাগর। কারণ এই ভারত মহাসাগর দিয়েই ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য চলে। তাই ভারত মহাসাগরের ওপর বিদেশি রাষ্ট্রের উপস্থিতি ভারতের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারত চায় এই মহাসাগরীয় অঞ্চলটি শান্তিপূর্ণ এবং শত্রুমুক্ত থাকুক। ভারতের বিদেশনীতিতে এই বিষয়টির গুরুত্ব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যখনই কোনো বিদেশি শক্তি ভারত মহাসাগরের ওপর সামরিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে (উদাহরণস্বরূপ দিয়েগো গার্সিয়া নামক দ্বীপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ, অথবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অনতিদূরে মায়ানমার অধিকৃত কোকো দ্বীপে চিনের নৌবাহিনীর অবস্থান), ভারতের পক্ষে তা যথেষ্ট উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোনো দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সীমান্ত ছাড়াও ভূখণ্ডগত আয়তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়তনের দিক থেকে ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। আয়তনে বড়ো হওয়ার কারণেই হিটলারের জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্বের জন্য তার এই সুবিশাল আয়তন অনেকটাই দায়ী।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন : কোনো রাষ্ট্র আর্থিকভাবে কতখানি উন্নত, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তার বিদেশনীতির গতিপ্রকৃতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে পারলে তবেই সে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে পারে এবং নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে পারে। আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত থাকার কারণেই স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত ভারত তার বিদেশনীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। তাই ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য দেশের আর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করানো। স্বাধীন ভারত প্রথম থেকেই যে শান্তির আদর্শ প্রচার করেছে, এবং জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, তার পিছনে কাজ করেছে দেশের আর্থিক শক্তি বাড়ানোর তাগিদ।

একটি দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি আবার তার প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ সৌদি আরব যেদিন থেকে তার ভূগর্ভস্থ তৈলভাণ্ডারকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে, সেদিন থেকেই সে মধ্যপ্রাচ্যের একটি প্রভাবশালী দেশে পরিণত হয়েছে। আবার শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেই চলবে না, সেই সম্পদকে কাজে লাগানোর মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো চাই। না হলে সেই দেশকে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। বলাবাহুল্য অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল একটি দেশ বৈদেশিক ক্ষেত্রে স্বাধীন নীতি প্রণয়ন বা অনুসরণ করতে পারে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হওয়ার জন্য ভারত একটি যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী দেশ হওয়া সত্ত্বেও উপসাগরীয় যুদ্ধে নিয়োজিত মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলিকে তৈল সরবরাহ করতে ভারত বাধ্য হয়েছিল। তাই স্বাধীন বিদেশনীতি অনুসরণের জন্য অর্থনীতিতে স্বনির্ভর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে গত শতকের শুরু থেকে, যখন থেকে ভারত বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে এবং নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত তার অর্থনীতিকে একটা শক্তপোক্ত (Stable) অবস্থায় নিয়ে যেতে

Scanned with CamScanner

সক্ষম হয়। উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিয়ে ভারত ক্রমশই বিশ্বের দরবারে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে যে, বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় এতবড়ো একটি দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর বেশিদিন ব্রাত্য করে রাখা যাবে না।

(গ) ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার : বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনো দেশই তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বা পরম্পরাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। প্রাচীনকাল থেকে ভারত শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদিতে এই শান্তির ললিত বাণীই বারবার উচ্চারিত হয়েছে এবং সেই আদর্শের উত্তরাধিকার বহন করেছেন রাজা রামমোহন রায়, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ আধুনিক ভারতের রূপকারগণ।

শুধু ঐতিহাসিক পরম্পরার জন্যই নয়, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ভারতকে তার বিদেশনীতি প্রণয়নে শান্তি ও মৈত্রীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য করেছে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ভিত্তি করে যথাক্রমে মার্কিন জোট ও সোভিয়েত জোট—এই দুই পরস্পরবিরোধী জোটের মধ্যে অঘোষিত লড়াই, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের পরিস্থিতি, আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার ও প্রতিযোগিতা, অপর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা—এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে থেকে ভারতকে তার জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে বিদেশনীতি প্রণয়ন করতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের কাছে শান্তি ও জোটনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না। এ ছাড়া দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উগ্র জাতীয়তাবাদ ভারতকে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক করে তোলে। শুধু তাই নয়, জাতীয় স্বার্থের কারণেও ভারত এশিয়া, আফ্রিকা সহ বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার অনেক মিল আছে। তাই ওই সমস্ত দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদান বাড়ানোয় ভারত আগ্রহী হয়েছে এবং জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে ৭৭টি রাষ্ট্রের (G77) জোট গঠনে ভারত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

(ঘ) রাজনৈতিক মতাদর্শ : ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে রাজনৈতিক মতবাদের বা আদর্শের ভূমিকাও কম নয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র—এ দুটির কোনোটিই এককভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। ধনতন্ত্রের মধ্যে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রাধান্য পায়, সমাজতন্ত্রে তেমনি অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যে মতাদর্শ সেটি হল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, আর ভারত হল প্রকৃতপক্ষে এই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অনুগামী। তাই ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানার সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। আর বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও ভারত কী ধনতান্ত্রিক দেশ কী সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনো দেশকেই ব্রাত্য করে রাখেনি। বরং যেখান থেকে যতটুকু সুবিধা ও সহযোগিতা নেওয়ার ততখানি নিয়েছে। তবে গত শতকের ৯০-এর দশকের পর থেকে ভারত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

(ঙ) সংসদ (Parliament) : বিদেশনীতি নির্ধারণে একটি দেশের আইনসভা কতখানি ভূমিকা পালন করবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশটির রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চালু থাকা সত্ত্বেও সে দেশের আইনসভা (কংগ্রেস) বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ভারত ও ব্রিটেনের আইনসভার থেকে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের অনুমোদন ছাড়া শাসন-বিভাগ কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তি, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কার্যকর করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে জার্মানির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ভার্সাই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, তা সিনেটের অনুমোদন না পেয়ে বাতিল হয়ে যায়।

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ে ক্ষমতা যথেষ্ট কম। পররাষ্ট্র বিষয়ে ভারতের পার্লামেন্টের ক্ষমতা আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতীয় পার্লামেন্ট রাষ্ট্রদূত নিয়োগ বা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতা ভোগ করে না। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে যে পরামর্শদান কমিটি রয়েছে, তার ক্ষমতা শুধুমাত্র পরামর্শদানমূলক। কমিটির

Scanned with CamScanner

সুপারিশ সরকার গ্রহণ করতেও পারে, নাও পারে। তবে পররাষ্ট্র বিষয়ে শুধুমাত্র একটি ব্যাপারে পার্লামেন্ট কিছুটা ক্ষমতা ভোগ করে এবং সেটি হল পররাষ্ট্র নীতি রূপায়ণে আর্থিক বরাদ্দের জন্য শাসনবিভাগকে আইনসভার ওপর নির্ভর করতে হয়।

(চ) ক্যাবিনেট ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রধানত দু-ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়—রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং সংসদ শাসিত। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রচলিত থাকার জন্য শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, বিশেষ করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্রপতি ও তাঁর ক্যাবিনেটের হাতে ন্যস্ত থাকে। অবশ্য মার্কিন সিনেট রাষ্ট্রপতির সন্ধি, চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আবার ভারতের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্লামেন্ট বা সংসদ শাসনবিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাই ভারতে বিদেশনীতি পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানত পররাষ্ট্রমন্ত্রকের ওপর ন্যস্ত থাকলেও সংসদ এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারে, বিতর্কের আয়োজন করতে পারে। তবে সংবিধানগতভাবে সক্ষম হলেও কার্যত ভারতের আইনবিভাগ বা সংসদ সাধারণত সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। ভারতে বিদেশ সংক্রান্ত মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারণ করে ক্যাবিনেট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (Cabinet and the Prime Minister's Office–PMO)। ক্যাবিনেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োগ। ক্যাবিনেটের পররাষ্ট্র দপ্তর এই ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। এই দপ্তরটি একজন বিশিষ্ট ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনে কাজ করে। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের ওপর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ থাকে। বস্তুতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই হলেন ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান স্থপতি। তাঁর বক্তব্যই ভারতের সরকারি ভাষ্য হিসেবে গণ্য হয়। ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধি বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ, ভারত সোভিয়েত চুক্তি, সিমলা চুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নির্দেশ মতো ৭০-এর দশকে পররাষ্ট্র মন্ত্রকে একটি নীতি নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। শ্রীমতী গান্ধির বিশেষ আস্থাভাজন ভি. পি. ধরকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যে সমস্ত সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদিত হয়, সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের যাবতীয় সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদকে জানানো হলেও এ ব্যাপারে সংসদের কোনো কার্যকর ভূমিকা থাকে না। আবার জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় সংসদের কাছে গোপন রাখা হয়। ১৯৭১ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত ছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির। মনে রাখতে হবে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণে যে বিলম্ব ঘটে, একটি স্বৈরাচারী বা একনায়কতান্ত্রিক দেশে বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা ঘটে না, সেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(ছ) রাজনৈতিক পরিস্থিতি : বিদেশনীতি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে শুধু প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র দপ্তর নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধর্মীয় কারণে, জাতিগত কারণে, দলীয় রেষারেষির কারণে, আরও নানা কারণে একটি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতে পারে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে পারে, যা স্থায়ী এবং দৃঢ় পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর, দেবগৌড়া প্রমুখের আমলে ভারতের পক্ষে দৃঢ় বিদেশনীতি প্রণয়ন করা ও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে নরসিংহ রাও, মনমোহন সিং, নরেন্দ্র মোদী প্রমুখের আমলে ভারত তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অনেক দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।

(জ) সামরিক শক্তি : বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল দেশের সামরিক শক্তি। সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে তার বিদেশনীতি রূপায়ণের কাজটি যত সহজ হয়, একটি দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' নীতির অন্যতম প্রধান শরিক হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬২ সালে চিন ভারতকে আক্রমণ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি। ভারত যদি অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশ হত, তাহলে চিনকে এই ধরনের আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করার আগে অনেকবার ভাবতে হত। এই কারণেই

Scanned with CamScanner

একটি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে সামরিক খাতে প্রচুর ব্যয় করতে হয়েছে, এমনকি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে হয়েছে। বর্তমানে ভারত শুধু সামরিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও যথেষ্ট শক্তিশালী দেশ। স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে আর আগের মতো বৈদেশিক ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। বর্তমান দিনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই ধরনের আস্থার উদয় হয়েছে যে, ভারত তার নিজের জোরে বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে ভারত শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বের একটি নেতার ভূমিকায় থাকতে রাজি নয়, সে এখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার দাবিতে অটল। বর্তমানে ভারত তার বিদেশনীতি থেকে আদর্শবাদকে ঝেড়ে ফেলে ক্ষমতার রাজনীতির (Power politics) ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে।

(ঝ) বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি : ভারতের বিদেশনীতি প্রণয়ন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে-কোনো দেশের মতো ভারতেরও পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তনের ধারা লক্ষ করলে দেখা যাবে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যে বিদেশনীতি গড়ে তোলা হয়েছে, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে তার পরিবর্তন সাধনও করা হয়েছে। ভারত যখন স্বাধীন হয়, তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন জোট ও সোভিয়েত জোটের মধ্যে ঠান্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দ্বি-মেরুতার উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছে। ভারতের তখন প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখা। এই প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত যে-কোনো প্রকার জোট রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছে, জোটনিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য কোনো জোটের বিরাগভাজন না হয়ে উভয়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য বা ঋণ পাওয়া। তা ছাড়া ভারতের কাছে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ—এ দুটির কোনোটিই এককভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাই তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করলে ভারত তার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করতে সমর্থ হবে।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপর্যয় এবং ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের প্রেক্ষিতে ভারত তার বৈদেশিক নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও বুঝেছিলেন, এক-মেরু বিশ্বে ভারতের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো এবং তার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতির উদারীকরণ। ক্ষমতায় আসার ২ মাসের মধ্যেই রাও সরকার অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে একগুচ্ছ সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকারের এই নয়া উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে মার্কিন সরকার ১৯৯৫ সালে US-India Commercial Alliance গঠন করে এবং ভারতকে বৃহৎ সম্ভাবনাময় বাজার (Big Emerging Market) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ফলত দু-দেশের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হয়।

১৯৯৮ সাল নাগাদ ভারত ও পাকিস্তানের পরমাণু বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি পুনরায় পরিবর্তিত হয়। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটায়। একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক তলানিতে এসে দাঁড়ায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠতে ভারত একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনায় বসে এবং অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। প্রায় একইসঙ্গে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারত তার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করার ব্যাপারে নিরলস এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে, যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতের বিদেশনীতি গঠনের উপাদানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই, বিশেষ করে বাহ্যিক উপাদানটি যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারত কখনও জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে, কখনও তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীন দেশগুলির অন্যতম প্রধান মুখপাত্র হয়ে কাজ করেছে, কখনও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্যায্য নীতি ও কার্যকলাপের নিন্দে করেছে, কখনও বা নীতি বা আদর্শের কথা ভুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছে। একবিংশ শতক থেকে ভারত তার 'পূর্বে তাকাও'

Scanned with CamScanner